Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 158– 164
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নারীবাদী দৃষ্টিতে চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস : একটি সমীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : Rabindranathmandal95@gmail.com

Keyword
নারীবাদ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, শচীদেবী, লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া।

Abstract
নারীবাদ বিষয়টি নব্বইয়ের দশকে আমাদের দেশে চর্চিত ও সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে। নারীবাদ কী? চৈতন্য জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসে নারীবাদের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা কতটা প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন তা মূল প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

Discussion
সাম্প্রতিক কালে 'নারীবাদ' বিষয়টি বহুল প্রচলিত এবং চর্চিত, ঠিক একই সঙ্গে বিতর্কিতও বলা চলে। তবে আমাদের প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার নারীবাদ কী এবং কেন? নারীবাদ বিষয়টির মধ্যে 'নারী' শব্দটি আছে। নারীবাদের মূল কথা হল লিঙ্গ সমতা, নারী ও পুরুষের সামাজিক সমতা। সমতার দিক থেকে নারীরা আসলে পুরুষের থেকে দীর্ঘকাল পিছিয়ে। নারী নিপীড়নে ও নারী নির্যাতনে প্রতিটি মুহূর্তে অত্যাচারিত হওয়ার কারণেই নারীবাদ বিষয়টি উঠে এসেছে। Elinor Burkett-এর মতে,

> "At its core, feminism is the belief in full social, economic, and political equality for women."[১]

নারীবাদ হল এমন একটি চিন্তাধারা যা নারীকে আত্মসচেতন করে তোলার এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আধিপত্য থেকে নারীমুক্তির প্রয়াসেই জন্ম হয় নারীবাদ। অধ্যাপিকা বাসবী চক্রবর্তী বলেছেন,

> "নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীর মুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একইসঙ্গে তার প্রয়োগগত দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।"[২]

নারী ও পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতায় একটি পরিবার, সমাজ, ও মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে আধুনিক কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন—

"সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ-কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী। অর্ধেক তার নর।"[৩]

কিন্তু বাস্তব সমাজে নারী ও পুরুষকে আলাদা ভাবে দেখা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন, গৃহের কর্ম, সেবা, যৌন পরিতৃপ্তি অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদি সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় করা হয় তাহলে দেখা যাবে নারী শৈশবে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে সন্তানের অধীনে। গৃহের অভ্যন্তরে গৃহকর্মের মধ্যে রেখে নারীদের বঞ্চিত করে রাখা হয়। নারীবাদ তত্ত্বের মূল কথা হল লিঙ্গ সমতা নির্ধারণ, স্থাপন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নারী যে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে, সেই অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো নারীবাদের মূল লক্ষ্য।

এদেশে নয়, পাশ্চাত্যে নারীবাদের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। ফরাসি দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ার ১৮৩৭ সালে 'ফেমিনিজম' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন। সমাজে যারা কালো নারী বা যাদের গায়ের রঙ কালো তারা শোষিত, বঞ্চিত হত। কালোর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীকালে নারীবাদ নারী শিক্ষা, নারীর অধিকার, ভোটের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নারী স্বাধীনতা ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, যৌন হয়রানি, চাকরির অধিকার, সম বেতনের অধিকার, বিবাহ নানা অধিকারের বিষয় হয়ে ওঠে নারীবাদ। লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ রাজনীতি, লিঙ্গ নির্যাতনের অবসান ঘটানো এই নারীবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। নারীবাদ বলতে শুধুমাত্র নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে বলা হয় না, সেই সঙ্গে নারী সত্তার বোধের জাগরণ, নারীচেতনা বাড়ানো, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচারণকে দূর করাও অঙ্গীভূত। নারীবাদী আন্দোলন আসলে পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। রাশিদা আখতার খানমের ভাষায় নারীবাদ হল—

> "নারীবাদ পুরুষবিদ্বেষী কোনো মতবাদ নয়; নারীর পশ্চাৎপদতা, নারীর অধিকারহীনতা, তার বঞ্চনার কারণ অন্বেষণ করা ও সেগুলো মোচন করার পন্থা বের করা নারীবাদের উদ্দেশ্য। সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেসব অন্যায়ের শিকার মানুষ হচ্ছে সেসব অন্যায় দূর করা নারীবাদের উদ্দেশ্য। অন্যায়ের বিনাশ করতে পারলে কেবল নারী যে সুফল ভোগ করবে তা নয়, সকল মানুষই অন্যায়মুক্ত সমাজের সুফল পাবে।"[৪]

ইউরোপ ও আমেরিকায় বিংশ শতকের ষাটের দশকে নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ উঠেছিল, আর তার প্রভাব পড়েছিল আমাদের দেশে সত্তর-আশির দশকে। তবে কি এদেশে এর আগে নারীদের কথা বলা হয়নি, অবশ্যই হয়েছে। নারী সম্পর্কিত বিষয় অনেক আগে থেকেই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই নারীহিতের জন্য রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখরা এগিয়ে এসেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসন কালে নারী শিক্ষার গুরুত্ব বেড়েছে। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকামিনী দাসী, কামিনী সুন্দরী দেবী, রাসসুন্দরী দেবী (১৮১০-১৮৯৯), সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫), ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০), জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮), মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩-১৯০২), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮০৫-১৯৩২) নিজেদের আত্মজীবনের কথা, বঞ্চনার কথা, না পাওয়ার কথা লিখেছেন। পরবর্তীকালে কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), কুসুমকুমারী দাস (১৮৭৫-১৯৪৮), প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯), মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১), মন্দাক্রান্তা সেন (১৯৭২-) সমাজে নারীদের প্রতিষ্ঠার কথা তাঁদের কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫), তসলিমা নাসরিন (১৯৬২-), দেবারতি মিত্র, জয়া মিত্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের রচনায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁরা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নারীদের বঞ্চনা, অবহেলা, অসহয়তার দিকগুলি সাহসের সঙ্গে লিখেছেন। এ বিষয়ে পুরুষ ঔপন্যাসিকরা পিছিয়ে নেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮), সমরেশ বসু (১৯২৪-

১৯৮৮), দীপক চন্দ্র (১৮৩৮-২০১৩) প্রমুখরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এদেশে নয়ের দশকে নারীবাদের তৃতীয় ঢেউ দেখা দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীবাদের নানা পরিবর্তন এবং নানা রূপ ধারণ করে।

স্বাধীনতার তিরিশ বছর পর বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রবণতার মধ্যে 'নারীবাদ' দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে চৈতন্যজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি এক অভিনব প্রয়াস। এই উপন্যাসগুলি পাঠক সমাজে যথেষ্ট সাড়া তুলেছিল। মধ্যযুগের চরিত সাহিত্যে নারীরা উপেক্ষিত ও বঞ্চিত ছিল কিন্তু একালের ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের আঙিনায় বাস্তবতায় নারীদের অভিযোগগুলি তুলে ধরেছেন। আধুনিক যুগের নারীরা প্রতিবাদী, সাহসী ও নিজের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। তবে এই প্রবন্ধে সমগ্র বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়, আমরা চৈতন্য কেন্দ্রিক দুটি উপন্যাসে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরেছি। সমরেশ বসুর 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' (১৯৮৭) ও দীপক চন্দ্রের 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' (২০০১) এ বিষয়ের দুটি উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য। আশির দশকের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে চৈতন্যজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস দুটি রচিত হয়েছে। ১৯৭৫-৮৫ সময়কালকে 'নারীর দশক' বলা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ই মার্চ নারীদের সম্মান জানানোর জন্য 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালন করা হয়। আমরা প্রায় সংবাদপত্রে দেখি নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, পণপ্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ ও বাল্যবিবাহের মত নানা ঘটনা বাংলা উপন্যাসেও তার প্রভাব পড়েছে।

পঞ্চাশের দশকে কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) 'ভ্রমর' ছদ্মনামে 'প্রেম নিত্য', অনিত্য সংসার', এবং 'প্রভু, কার হাতে তোমার রক্ত' তিনটি শিরোনামে 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' উপন্যাসটি লিখেছেন। পরবর্তীকালে একত্রে 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি ইতিহাস আশ্রিত শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণ জীবনী মূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র নিমাই, শচীদেবী, লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া অন্যান্য। নিমাইয়ের প্রথম পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্প দংশনে মারা যাওয়ার পর, শচীদেবীর নির্দেশে নিমাই নবদ্বীপের সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া রূপবর্তী, সুন্দরী এবং অর্থবান ঘরের কন্যা। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে কোন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নিমাই সংসারের থেকেও সংসারের প্রতি তাঁর মন নেই। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি উদাসীন ছিলেন। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাইয়ের সামনে বসিয়ে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলে তার ফল বিপরীত হয়। নিমাই গয়া থেকে পিতৃ পিণ্ডদান করে গৃহে ফেরার পর সন্ন্যাস নিয়ে গৃহ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে বিষ্ণুপ্রিয়া একটি নতুন গামছা স্বামীর পায়ে ধরে বলেন,

> "তুমি যেখানেই যাও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি কী– কী নিয়ে থাকব বল? আমার কী আছে? রামের সঙ্গে সীতা বনে গেছিলেন, যুধিষ্ঠীরের সঙ্গে দ্রৌপদি।"[৫]

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার কথা বললে নিমাই রাজি হননি। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন নিমাইকে প্রশ্ন করেন তোমার ঘর কি সুখময় নয়? তুমি যখন সিদ্ধান্ত করেছ গৃহে থাকবে না, সন্ন্যাস নেবে, তাহলে পুনরায় বিবাহ কেন করলে? একটি নারীর জীবন নিয়ে কেন খেলছ? বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে অভিযোগ করে বলেন—

> "তোমার মায়ের অনুরোধে, আমার বাবার সত্য পালনের জন্য, ভুলিয়ে আমাকে বিয়ে করলে? করলে যদি, কেন ছেড়ে যাও? তবে বিষ দাও। নয় তো আমি আগুনে প্রবেশ করি।"[৬]

তুমি আমার স্বামী তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই বুঝি না। নিমাই তখন ছলনা আশ্রয় নিয়ে রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানা কৌতুকে অশেষ চুম্বন করে, শৃঙ্গার রসে সোহাগ করে, অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া করে। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোলে বসিয়ে মুখে পানের খিলি তুলে, বস্ত্রের ও কাঁচুলি খুলে, স্তনে কস্তুরি চন্দন মাখিয়ে রতিবিলাস করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা গেলে নিমাই সেই সুযোগে রাত্রেই গৃহত্যাগ করেন। অবশেষে নিমাইকে গৃহ ত্যাগের জন্য ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আসলে নিমাইয়ের এই সন্ন্যাস ছদ্মবেশ। গৃহ ছেড়ে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন সন্ন্যাস। কিন্তু নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা চিন্তা করেননি, সে কি নিয়ে বাঁচবে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুম থেকে ওঠে আর্তনাদ করে বলেন, আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলে? আমার সংসার, জীবন, সবই যে অন্ধকার হয়ে গেল! বিষ্ণুপ্রিয়া আরও বলেন, এ কী শেল দিয়ে গেলে নারীর প্রাণে, একটি সন্তানও আমার শূন্য বুকে নেই! বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি নিমাই কোনদিনই খুশি হননি। অথচ বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন দোষ ছিল। এই রূপবর্তী, সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর প্রেম ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলেন। একটি সুন্দর সংসার তৈরির স্বপ্ন

দেখেছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শারীরিক ভাবে নির্যাতিত না হলেও মানসিক ভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। সমরেশ বসু বিষ্ণুপ্রিয়ার উপেক্ষা ও অবহেলা বিষয়টি এখানে স্পষ্ট করেছেন।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে নবদ্বীপের উচ্চশিক্ষিত পরিবারের চালচিত্র অঙ্কন করেছেন। জগন্নাথ মিশ্র নিজে একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং শচীদেবী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণা নারী। নিমাই নিজেও ছিলেন একজন পণ্ডিত এবং অধ্যাপক ব্যক্তি। নবদ্বীপে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ও নামডাক রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত পরিবারে বধূ নির্যাতনের ছবি এঁকেছেন। বিবাহের পর স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীর, কিন্তু নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে সংসার থেকে পালিয়ে গেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বঞ্চনার স্বীকার হয়েছেন। ঔপন্যাসিক বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিযোগগুলি সামনে এনেছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর উদাসীনতার প্রতি সজাগ হলেও নিরুপায়। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। সমরেশ বসু এই উপন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে জৈবিক ও মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুর্বল নারী হিসাবে গড়ে তোলেননি, বরং তাঁর মানবিক অধিকাররের দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। সমরেশ বসু নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নিখুঁতভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থান ও মানসিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। শচীদেবী নিজেও সন্তানের কাছে লাঞ্ছিতা হয়েছেন। লেখক নিজস্ব ভাষা ও শৈলী দিয়ে এই উপন্যাসে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জীবন্ত সমস্যাকে তুলে ধরেছেন।

পৌরাণিক উপন্যাসের খ্যাতি সম্পন্ন লেখক হলেন দীপক চন্দ্র। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনকে নিয়ে 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' (২০০১) উপন্যাস রচনা করেন। নবদ্বীপের উচ্চশিক্ষিত পরিবারের পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিমাই। নিমাই মায়ের বিরুদ্ধে ভালোবেসে নিজের পছন্দে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। শচীদেবীর এই বিবাহে মত না থাকলেও নিমাইয়ের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে আগেই চলে গেছেন, যদি নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেন। নিমাই লক্ষ্মীকে নিয়ে সুখে সংসার করলেও সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। লক্ষ্মী নিমাইকে বলেন—

> "তুমি কেমন ধরণের মানুষ বলত? সারাদিন কোথায় থাক, কী কর, কিছু বলে যাওয়া গরজ বোধ কর না? দুটো মানুষ যে পথের দিকে চোখ পেতে এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে সে কথাটাও একবার মনে হয় না। আমাদের তোমরা মানুষ মনে কর না? মেয়েমানুষ বলেই এত তাচ্ছিল্য আর অবহেলা?"[৭]

শচীদেবী বিবাহ মেনে নিতে বাধ্য হলেও মনের জ্বালা ও যন্ত্রণা ভুলতে পারেনি। শচীদেবী হেরে যাবার ফলে দুঃখ ও আত্মগ্লানিতে মন আচ্ছন্ন হয়েছিল। এই কারণেই লক্ষ্মীর সঙ্গে শচীদেবীর মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। নিমাই পূর্ববঙ্গে অর্থ উপার্জনের যাওয়া কথা বললে লক্ষ্মী কান্না ও চোখে জল নিয়ে নিমাইকে বলেন— "তোমার বড় কথা, বড় ভাব বুঝি না। নিজেকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব? আমার কি রইল?"[৮] নিমাই লক্ষ্মীকে মায়ের সেবা যত্নের দায়িত্ব দিয়ে পিতৃভূমি দর্শনে শ্রীহট্টে চলে যান। কবে স্বামী ফিরে আসবেন তা লক্ষ্মী জানেন না। এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন— "নিমাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে হোক এটা কোনদিন সে মনে প্রাণে চায়নি। তার নিজের পছন্দ করা মেয়ে ছিল সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করুক এটাই ছিল অন্তরের ইচ্ছা"[৯] শচীদেবী নিমাই ও লক্ষ্মীর বিবাহকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। নিমাই চলে গেলে বিরোধটা আরও বেড়ে যায়। নিমাইকে নিয়ে শাশুড়ি-বউয়ের মনোমালিন্য শুরু হয়। লক্ষ্মীর আচারণে, কথাবার্তাতে শচীদেবীর বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা দেখা যায়। লক্ষ্মী সব সময় মন মরা হয়ে থাকেন, নিমাইয়ের জন্য কান্না করেন। এই দেখে শচীদেবী লক্ষ্মীকে বলেন—

> "ওর দোষ কি? তুমি একটু চাইলেই ও যেত না শ্রীহট্টে। ওকে আটকানোর কোন চেষ্টাই করনি। দোষ তোমারই। তুমিই নিষ্ঠুর।"[১০]

শচীদেবীর তীক্ষ্ণ বাক্য লক্ষ্মীর সহ্য হয় না, তিনি বলেন— "আমি না হয় অবহেলা করেছি, কিন্তু মায়ের আদর তো ছিল। তাহলে মাতৃভক্ত ছেলেকে মা ঠেকাতে পারল না কেন?"[১১] ও নেই বলে, যা খুশি আপনি বলতে পারেন না। এ যেন বর্তমান কালের শাশুড়ি-বৌ। লক্ষ্মীপ্রিয়া ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তাঁদের মধ্যে দৈনিক ঝগড়া হত। লক্ষ্মীর প্রতি বিতৃষ্ণায় শচীদেবী বলেন—

> "দিনরাত মুখ পুড়িয়ে শুধু হা হুতাশ করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্বামী যেন কারো বিদেশে যায় না। ঢং। বিদেশ-বিভূঁইতে স্বামী থাকলে লোকে কত পূজা-অর্চনা করে, মানত করে, সে সব নেই, আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকা, দীর্ঘশ্বাস আরও চোখের জল ফেলা। এসব করলে সংসারে কখনও কল্যাণ আসে না। ঘরের বৌ হল লক্ষ্মী! তোমার নামটাই শুধু লক্ষ্মী।"[১২]

শচীদেবী আরও বলেছিল বিয়ে করিস না, শুনেনি আমার কথা, বছর না ঘুরতেই মোহ কেটে গেল। তাই ছল চাতুরী নিয়ে বিবাগী হয়েছে। কে জানে, আর ফিরবে কি না? সন্ন্যাসী ওর কুষ্ঠিতে লেখা। এই তিরস্কার শুনে লক্ষ্মীর আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করেনি। নিমাইয়ের অনুপস্থিতিতে এক গভীর যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছিল। অপমান, লজ্জা, যন্ত্রণা মনের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত মৃত্যুই তাঁর একমাত্র শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল। লক্ষ্মী অপমান সহ্য করতে না পেরে চলে গেলে শচী রূঢ় গলায় বলেন—

> "এই ভর সন্ধ্যেতে ঘরে ঢুকে খিল দিও না বলছি। ভাল হবে না কিন্তু। মেয়েমানুষের এত তেজ ভাল নয়। অন্ধকারে শচীর কণ্ঠস্বর কেমন কঠিন শোনাল।"[১৩]

লক্ষ্মীর গলা থেকে শব্দ শুনে অবাক বিস্ময়ে বলেছিলেন, লক্ষ্মী কি তবে বিষ খেয়েছ? ঠোঁটের কোণা বেয়ে কষ আর ফেনা গড়াচ্ছিল। এই মুহূর্তে শচীদেবী সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। যদি চেঁচায় তাহলে লোকে জানাজানি হয়ে যেতে পারে, এমনকি তাঁকে ভীষণ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। তাই আর্তনাদের স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৌমা এ তুমি কী করলে? সর্বনাশ করতে গেলে কেন? তোমাকে কি সাপে কেঁটেছে? লোককে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য শচীদেবী মিথ্যা কথা বলেছেন। লক্ষ্মীর মৃত্যুতে তাঁর একটা অপরাধ বুকে নাড়া দিয়েছিল। দীপক বাবু লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসে কোথাও সর্প দংশনের উল্লেখ নাই। লক্ষ্মীর ঠোঁটের কোণা বেয়ে কষ ও ফেনা গড়াতে দেখে শচীদেবী বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন। হয়ত লক্ষ্মী স্বামীর উদাসীনতা ও অবহেলা মেনে নিতে পারেননি। অবশেষে লক্ষ্মী অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার মত পথ বেছে নেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় লক্ষ্মীপ্রিয়া অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন— 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্প দংশনে মৃত্যু আমার যথার্থ মনে হয়নি। এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা।' (দৃষ্টিকোণ) নিমাইয়ের সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা লক্ষ্মীপ্রিয়া মন থেকে মেনে নিতে পারেননি বলে আত্মহত্যা করেছেন। মানসিক নির্যাতনই লক্ষ্মীপ্রিয়ার আত্মহত্যার কারণ। উচ্চশিক্ষিত পরিবারে স্বামী বিদেশে থাকার ফলে শাশুড়ির নির্যাতনে বধূর আত্মহত্যা ঘটনা। দীপক চন্দ্র বধূ নির্যাতনের সেই ছবিই এঁকেছেন।

শচীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর নবদ্বীপের ধনী সনাতন মিশ্রের, অর্থবান ঘরের কন্যা সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহ দেন। সে যুগে গুণের চেয়ে রূপকেই প্রাধান্য দেওয়া হত বেশি। নবদ্বীপে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর জাতি, বর্ণ মিলিয়ে দেখার প্রথা ছিল। এ বিবাহে নিমাইয়ের মত ছিল না, কিন্তু মায়ের আদেশে বিবাহ করেন। পঞ্চদশী বিষ্ণুপ্রিয়া বয়ঃসন্ধি কালের কিশোরী, শরীরে যৌবনের ঢল, ঋতুময়ী প্রকৃতির লাবণ্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ভরা প্রাণ। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সুখ প্রার্থনা করেন। লেখক বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন—

> "সে একজন অতি সাধারণ মেয়ে। স্বামী সংসারের সুখই তার প্রার্থনা। সে চায় স্বামীর সোহাগ, মমতা, ভালোবাসা। কিন্তু এ সব কিছুই বলতে পারল না। অতি কষ্টে সম্মোহিতের মত উচ্চারণ করল : আমাকে একটুও ভালবাস না, ভালবাসলে দুঃখ দিতে না।"[১৪]

কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি নিমাইয়ের কোন আকর্ষণ নেই। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া তীব্র অপমানে, লজ্জায়, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে স্বামীকে বলেন—

> "আমি কি করেছি? আমার শরীরটাকে যদি ঘেন্না কর তাহলে বিয়ে করলে কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি, তবে এ সর্বনাশ কেন করলে? কে চেয়েছিল তোমার মতো নামীদামী লোকের অনুগ্রহ।"[১৫]

নিমাই স্বপ্ন পূরণের জন্য গৃহ ত্যাগ করে চলে যেতে চাইলে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের অধিকারের কথা জানান। উত্তরে নিমাই বলেন 'আমার মা চেয়েছিল সংসারে দাঁড়ে বসানোর জন্যে তোমার মতো এক সুন্দরী মেয়েকে। পাখিকে খাঁচায় ভরলে সে কি তার ওড়ার আকাশ ভুলে যায়?' তখন বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে বলেন—

> "বাড়ির পোষা বিড়াল কুকুর থাকলেও তার জন্যে মায়া হয়। সেই সামান্য করুণাটুকুও কি আমি পেতে পারি না?"[১৬]

আমি কোন দোষ করিনি, মায়ের জন্য আমাকে এভাবে কষ্ট দেবে। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে প্রশ্ন করেছেন—

> "তবে এরকম বিয়ে করে আমার জীবনটা নষ্ট করলে কেন? আমি'ত কোন অপরাধ করিনি। কার দোষে আমাকে সারাজীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?"[১৭]

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার আত্মবেদনার কথা একবারও চিন্তা করেননি। যান্ত্রিক ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলেন—

> "কেঁদো না কৃষ্ণপ্রিয়া। ঈশ্বরের পূজার নৈবেদ্য তুমি। বৃহৎ একটি কাজের জন্যে তুমি আমি নিবেদিত্য।"[১৮]

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে কৃষ্ণপদে সঁপে দিয়ে গৃহ ত্যাগ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা এক নারী। তাঁর নিষ্ঠুর অবহেলা, উপেক্ষাকে বিষ্ণুপ্রিয়া মন থেকে মেনে পারেননি। নিমাই নবদ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করার কথা বললেও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছু বলেননি। তখন অভিমানের সুরে বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন—

> "মা, আমি তার নিষিদ্ধ ফল। সন্ন্যাসী মানুষ ভুল করে কখনও নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়াবে না। তুমি যাও। ভুলেও আমার প্রসঙ্গ তুমি জিগ্যেস কর না তাকে। তবে একটা প্রশ্ন কর তাকে। কোন মানুষ অস্পৃশ্য নয় তার কাছে, তাহলে আমি অস্পৃশ্য হলাম কেন? আমার কি একটু চোখের দেখা দেখতেও নেই? আমাকে দেখে যদি তার চিত্ত চঞ্চল হয়, তাহলে সন্ন্যাস নিল কেন? মনে মনে বনবাসী ভেবে উপেক্ষা করে ভুল করেছিল। অনুরূপ ভুল আপনি করলে আপনাকেও ভুলের মাশুল দিতে হবে।"[১৯]

বিষ্ণুপ্রিয়া বলেছেন সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা ছিল তখন নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গ দানের জন্য আমাকে বিয়ে কেন করলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বেদনা দূর করার জন্য সন্ন্যাস নিলেও ঘরের মানুষের মর্মব্যথা বুঝল না। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া অভিমানের সুরে জানান—

> "তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর উপর রাগ করব কেন? দুঃখটা আমার কপালের লেখা। বেশ ত সংসারী ছিল। আমি এলাম আর সংসারে তার মন রইল না। আমি তার সংসার ত্যাগের কারণ, এই দুঃখটা, অপমানটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমার মন্দ অদৃষ্টের জন্যে এমনটা হল। সে আমাকে ভুলে থাকলেও আমি তাকে ভুলে থাকব না। আমার সমস্ত সত্তায় তার নাম লেখা হয়ে গেছে। আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে সে আছে। আমি সেই নামেই তাকে অহরহ ডাকব। সে করছে কৃষ্ণের অন্বেষণ, আমি করব তাকে আহ্বান। ভক্তের ডাকে যদি ভগবান আসেন, তবে আমার আরাধনায় তাকে আসতেই হবে।"[২০]

নিমাইয়ের সঙ্গে জননীর পছন্দ করা কনে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি! বরং বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করে নিমাই মায়ের উপর লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর শোধ নিয়েছে। সন্ন্যাসী হয়ে জননীকে প্রিয়জন বিরহের কষ্ট দিয়েছেন। পরোক্ষভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করে নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে মায়ের প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা একবারও চিন্তা করেননি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) কাব্যের নায়িকারা স্বামী ও প্রেমিকের কাছে অভিযোগ করেছেন তেমনি ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়ার আত্মবেদনার কথা তুলে ধরেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার উপেক্ষিতার দিকগুলি তিনি খুব যত্ন সহকারে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই দুটি উপন্যাস আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নারীরা আজও অবহেলিতা, বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা ও নির্যাতিতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উচ্চশিক্ষিত পরিবারে নারীরা শারীরিক ভাবে অত্যাচারিত না হলেও মানসিকভাবে নির্যাতিতা। দেখা যাচ্ছে নারীরাই নারীদের অত্যাচারে সাহায্য করেছে। সমরেশ বসু ও দীপক চন্দ্র নারীদের মানবিক মূল্যবোধ, অধিকার ও বঞ্চনার দিকগুলি সামনে এনেছেন। মধ্যযুগের নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না। একালের আধুনিক নারী বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উপর প্রতিবাদ ও অভিযোগ জানিয়েছেন এবং মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। চার দেওয়ালের গণ্ডী থেকে বেড়িয়ে এসেছেন। এই নারীরা প্রতিবাদী, সাহসী, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। সমাজে নারীদের অধিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে আজও নারীদের সংগ্রাম করতে হয়, করতে হবে, যতদিন না পুরুষতন্ত্রের দেওয়াল না ভাঙবে।

তথ্যসূত্র :

১. Burkett, Elinor, et al., Editors. "Feminism". *Encyclopedia Britannica*, 27 Aug. 2021. Accessed on 4 Oct. 2021
২. বসু, রাজশ্রী, এবং বাসবী চক্রবর্তী, (সম্পা.) *প্রসঙ্গ: মানবীবিদ্যা*, উর্বী প্রকাশন, ২০০৮, পৃ. ৩৮
৩. bengaliebook.com/sammobadi-kazi-nazrul-islam
৪. রহমান, হাবিব আর, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ধ্রুপদী ও আধুনিক, কথাপ্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩৭৮
৫. বসু, নিমাই (সম্পা.) *কালকূট রচনা সমগ্র,* সপ্তম খণ্ড, (জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য) মৌসুমি প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৩৩৮
৬. বসু, নিমাই (সম্পা.) *কালকূট রচনা সমগ্র,* অষ্টম খণ্ড, (জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য) মৌসুমি প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৩৪৩
৭. চন্দ্র, দীপক, *সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য*। দে'জ পাবলিশিং, ২০০১, পৃ. ৪৬
৮. তদেব, পৃ. ৪৭
৯. তদেব, পৃ. ৪৭
১০. তদেব, পৃ. ৯৮
১১. তদেব, পৃ. ৯৯
১২. তদেব, পৃ. ১০০
১৩. তদেব, পৃ. ১০১
১৪. তদেব, পৃ. ১১০
১৫. তদেব, পৃ. ১০৯
১৬. তদেব, পৃ. ১০৯
১৭. তদেব, পৃ. ১০৯
১৮. তদেব, পৃ. ১১০
১৯. তদেব, পৃ. ১৬৩
২০. তদেব, পৃ. ১৬৪